সুন্দরবনে বিকৃত পর্যটন শিল্প ও পর্যটন অর্থনীতির বিশ্লেষণ

ড. এ কে এনামুল হক

সুন্দরবন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের একটি। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এমন নৈসর্গিক সৌন্দর্য পাওয়া যাবে। এ বন রক্ষা করা কেন উচিত? এ প্রশ্নের জবাবে হয়তোবা বলবেন যে, 'এটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য।' কেউ কেউ বলবেন, 'তা রক্ষা করার কারণ হলো, আমাদের একমাত্র রাজকীয় বাঘকে রক্ষা করা।' কিন্তু কেন? কেন বাঘ রক্ষা করবেন, তার উত্তর কী? আবার কেউ বলবেন, 'সুন্দরবনকে রক্ষা করব কারণ আমরা গোটা বিশ্বের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এটি একটি রামসার তালিকাভুক্ত এলাকা।' কী করে রামসার তালিকাভুক্ত হলো? কেন করা হলো? কে প্রস্তাব দিল? কী কারণে প্রস্তাব দিল? বলবেন, 'এত প্রশ্নের জবাব দেয়া আমাদের কাজ নয়। রামসার তালিকায় আছে, তাই রক্ষা করা দায়িত্ব।'

বছর পনেরো আগে এক সেমিনারে গিয়েছিলাম শ্রীলংকায়। সেখানে এক বিশ্লেষক আমাদের জানালেন, কী করে শ্রীলংকা প্রায় ৫০ লাখ ডলার খরচ করে গড়ে তুলেছে অতিথি পাখির জন্য একটি অভয়াশ্রয়। তার মতে, এটি শ্রীলংকার একটি বিশাল পদক্ষেপ। গর্বের বিষয়। আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম, কেন খরচটি করলেন? উত্তর ছিল, 'আমরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, তাই আমরা অতিথিদের জন্য খরচ করেছি। আমাদের গর্ব এখানে।' ফের জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি আপনাদের দেশীয় পাখির জন্য কিছু করেন? বললাম, আমাদের দেশে ঘুঘু বা শালিক রক্ষা করার জন্য কিছু করি না, কিন্তু অতিথি পাখি নিয়ে আমরা যথেষ্ট আবেগী। ভদ্রলোকের চোখে-মুখে ততক্ষণে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট! কী বলতে চাইছেন? আমি আসলে আপনাদের (মানে শ্রীলংকার) কাজটি নিয়ে খুব অসন্তুষ্ট নই। আমার অসুবিধা অন্যত্র। যাদের রক্ষার জন্য এসব কার্যক্রম, সেই পাখি কি তার দেশে সংরক্ষিত? যদি সংরক্ষিত না হয়, তবে আমরা কেন তাকে রক্ষা করব? আমরা খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে ফেরত পাঠালে তারা তা স্বীকার করবে, তাতে আমার কী লাভ? আর তা যদি সংরক্ষিত হয়, তবে আমরা কেন তাদের সংরক্ষণের জন্য খরচ করব? বরং আমাদের অর্থ আমরা আমাদের পাখির জন্য খরচ করি না কেন? বিরক্তির বদলে তার চোখেও প্রশ্নবোধক চিহ্ন তৈরি হলো। আমার জিজ্ঞাসার সমাপ্তি ওই খানেই।

বলছিলাম সুন্দরবনের কথা। আমরা কার জন্য এ বন রক্ষা করছি? বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট নয়। প্রশ্নটি কিন্তু হঠাৎ করে মনে আসেনি। ঘটনাটি খুলে বলি। ১৯ জানুয়ারি আমি ও আমার এক বিদেশী বন্ধু মিলে গিয়েছিলাম সুন্দরবনে। আমরা দুজনই এর আগে বহুবার গিয়েছি সুন্দরবনে। বন ও প্রাণীর কাছে যাওয়ার আকুলতা নিয়েই যাই সেখানে। একবার তো আমরা বাঘের মুখেই পড়ে গিয়েছিলাম কটকায়। সেখানে বাঘ দেখতে যারা গেছেন, তাদের অধিকাংশই ফেরত এসেছেন পায়ের ছাপ দেখে কিংবা বাঘের আক্রমণের নানা গল্প শুনে। আপনার গাইড, উপস্থিত নৌকার মাঝি বা বন বিভাগের কোনো কর্মকর্তাই হয়তোবা আপনাকে গল্পটি শোনাবে আর আপনি অতি আগ্রহে তা শুনে প্রীত হবেন। দেখার মধ্যে দেখবেন হরিণ আর ভাববেন বাঘ না দেখে ভালোই হয়েছে! মরে যাওয়া থেকে তো বেঁচে গেছি! আপনার মূল উদ্দেশ্য বাঘ দেখা নয়, বাঘের পায়ের ছাপ দেখা আর নৌকা ভ্রমণ! তবে বাঘ না থাকলে কিন্তু সুন্দরবনের সঙ্গে রাতারগুলের পার্থক্য থাকে না।

সপরিবারে যাবেন সুন্দরবনে তিন বা চারদিনের জন্য। প্রতিদিন নতুন স্থান, প্রতিরাতে নতুন দৃশ্য, নির্মল বাতাস উপভোগ করবেন, পাখি দেখবেন, বাতাসে পাতা পড়ার শব্দ শুনবেন। বাঘের গল্প শুনবেন কিংবা সুন্দরবনের খালে নিঃশব্দ নৌকা ভ্রমণের সময় নিস্তব্ধতার শব্দ শুনবেন, নিজের কানকেই বিশ্বাস করবেন না। পাতায় পা দিলে শব্দ হয় জানতেন, কিন্তু পাতা পড়ার শব্দ কখনো কি শুনেছেন? এখানে পাতা পড়লেও শব্দ হয়! মেঘমুক্ত আকাশে ৩৫ হাজার ফুট ওপর দিয়ে বিমান উড়ে গেলে তা হয়তো দেখেছেন, কিন্তু ৩৫ হাজার ফুট ওপরের বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ শুনেছেন কখনো? গা ছমছম করবে আপনার, বনের ভেতর হাঁটতে গিয়ে নয়, বনের পাশের খালে নৌকায় বসেই আপনার মনে হবে যে, এই বুঝি বাঘ এল! লক্ষ করে দেখবেন, প্রতিটি শব্দ কেন যেন এখানে স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রতিটি পাখির ডাক পৃথক মনে হবে, পাখিরা যে কথা বলে, তাও বুঝতে পারবেন। বনের এক কোণে বনমোরগের ডাক শুনে চুপ করে থাকবেন। কারণ অন্য কোণে আরেকটি মোরগ উত্তর দেবে ৫ থেকে ১০ সেকেন্ডের মধ্যেই। এক পাখির ডাকে অন্যটি উত্তর দেবে। হরিণ দেখেছেন অনেকেই, কিন্তু হরিণের ডাক শোনেননি। কেন ডাকে? তাকে বাঁচাতে আপনার সাহায্য চাইছে, নাকি অন্যদের বলে দিচ্ছে— বাঘ আসছে! দেখবেন হরিণ আর বন্য শূকরের পায়ের ছাপ। ওরা খালের এপাশ থেকে ওপাশে যায় প্রতিনিয়ত। দেখবেন খালের পাড়ে হরিণ আপনাকে দেখছে। সঙ্গে একটি বাচ্চাও থাকতে পারে। দেখবেন আপনার গাইডরা বেজায় ভদ্র। বাঘকে বাঘ বলে সম্বোধন করবে না, মামা বলে ডাকবে। শ্রদ্ধা বা ভালোবাসার ডাক নয়, ভয়ের ডাক। নাম ধরে ডাকলে বাঘ রাগ করতে পারে! বলবে, এই যে মামার পায়ের ছাপ। এখান দিয়েই 'তিনি' খাল পার হয়েছেন। এ বনে সবাই সবাইকে নজরে রাখে। আপনি বানরকে দেখবেন আর বানর আপনাকে দেখবে। আপনি পাখি দেখবেন আর পাখি আপনাকে দেখবে! বাঘও আপনাকে দেখবে, কিন্তু আপনি না দেখলেই বিপদ। চোখ-কান খোলা রাখবেন।

সুন্দরবনের সবকিছুই প্রকৃতি নিজ হাতে গড়ে তুলেছে। সবাই সবাইকে আড়াল করে রাখে। বনের মাঝে মরা গাছ দেখে ভাববেন না— আহা! কেটে নিয়ে চেয়ার বানালে উপকার বেশি হতো। একটু পরেই শুনবেন ঠক ঠক ঠক— কাঠঠোকরার শব্দ। তাকালেই দেখবেন, ওই মরা গাছের গায়ে বসেই সে আপন মনে কাজ করছে, তাকাচ্ছে না কোথাও। একান্ত মনে সে করে চলছে ঠক ঠক ঠক। খাবার লুকাবে ওখানে। মাঝে মাঝে ভাবি, ওদের খাবার কি চুরি হয়? তার শব্দ গোটা বনকে যেন নাড়াচ্ছে। আবার দেখবেন বানরের লম্ফজম্প। তাদের চিৎকার নিজেদের বাঁচাতে নয়, পোষা হরিণকে বাঁচাতে। বলছে, বাঘ আসছে। পালা! হরিণ আর বানরের পারস্পরিক সৌহার্দ দেখার মতন। অনেকে বলেন, এ বনে বানর হরিণ পালে। বনের গাছগুলো দেখবেন পাঁচ ফুট উপরে কেটে রাখা হয়েছে।

এত বড় বন, কিন্তু কেওড়া গাছের নিচে পাঁচ ফুটের সব পাতা কেটে ফেলা হয়েছে। বাঘ এলে দেখা যাবে! কে এত বড় বনের মালি? আর কেউ নয়। হরিণ। কেওড়া গাছের পাতা তাদের পছন্দ। চার পায়ে নয়, দুপায়ে দাঁড়িয়ে তারা খায়। তাই তো মনে হবে মালির কাজ। আরো আছে। ঝোপঝাড়ের যেদিকে তাকাবেন, সেদিকেই দেখবেন কেউ না কেউ পাহারা দিচ্ছে। হরিণের কান খাড়া। এ বনে পাতা নড়ার শব্দও পাওয়া যায়। তাদের কান বাঘের পায়ের দিকে। মালির কাজ তারা করেছে, ফলে বাঘের আড়াল থাকল না। তাকে দেখা যাবে। আক্রমণ করতে পারবে না। রাতের বেলায় তারা দলবেঁধে চলে আসবে বনকর্মকর্তার বাসা কিংবা অফিসের পাশে। কেমন করে যেন টের পেয়ে গেছে যে, বাঘ বন বিভাগকে ভয় করে চলে! তাই বন অফিস অনেকটা নিরাপদ। আরো আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, অমাবস্যার রাতে নৌকায় চড়বেন। সঙ্গে কোনো আলো রাখবেন। চলে যাবেন নিঃশব্দ

> প্রকৃতিনির্ভর কোনো পর্যটন শিল্পে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করলে তাতে প্রকৃতি বিপন্ন হয়। অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা কি ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পর্যটক পাঠাচ্ছি? আমার মনে হলো, প্রকৃতির ধারণক্ষমতা প্রকৃতির ক্ষমতার ওপরই কেবল নির্ভরশীল নয়। আমাদের আচরণের ওপরও তা নির্ভর করে। অর্থনীতির মূলকথা, মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করা আমাদের কাজ। আমাদের পর্যটকের সংখ্যা পৃথিবীর বহু দেশের পর্যটক সংখ্যার চেয়ে কম। এত অল্পসংখ্যক পর্যটকই যদি বনকে বিরান করে ফেলে, তবে আমরা যখন মধ্যম আয়ের দেশ হব, তখন কী হবে?

অঞ্চলে, যেখানে আলোর আবছায়াও পাবেন না। মনে মনে ভাববেন— বাঘের বাড়ি যাব। যাবেন ছোট খালে নিঃশব্দে। আপনার কান থাকবে খাড়া হরিণের মতো। নৌকা চালাবেন নিঃশব্দে। আপনার গা ছমছম করবে। একটু সরু খালে গেলেই দেখবেন আলোর ঝলকানি। বনে নয় পানিতে। দেখবেন মাছ যখন লেজটি নাড়াবে, তখনই জ্বলে উঠবে ফ্লোরেসেন্ট বাতি পানির ভেতর থেকে! তাকাবেন মাঝির বৈঠার দিকে, পানিতে হাত দেবেন, জল ছিটাবেন, আলোয় আলোয় ভরে যাবে চারদিক! বর্ণনাটি দিলাম আপনার আকর্ষণ বাড়াতে নয়, বোঝাতে যে আমরা সুন্দরবনকে রক্ষা করি তার অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে। তবে উপভোগের মৌলিক উপাদান নিঃশব্দতা। আমরা যত অর্থই খরচ করি না কেন, নিঃশব্দতা না থাকলে কিছু উপভোগ করতে পারবেন না। স্রেফ নৌকা ভ্রমণ হবে।

অর্থনীতির ভাষায়, এ উপভোগের জন্যই আমাদের এত খরচ। এর সবটুকুই আমাদের জাতীয় আয়ে যুক্ত হয়। এ সৌন্দর্য না থাকলে সুন্দরবনের সঙ্গে বান্দরবনের কোনো পার্থক্যই থাকে না। আমাদের আকর্ষণ প্রতি ক্ষেত্রেই আলাদা। কিন্তু কখনো যদি এ সৌন্দর্য না থাকে তখন? তখন আপনি সুন্দরবনে না গিয়ে যাবেন ভিনদেশের কোনো বনে। তাতে আমাদের জাতীয় আয় বাড়বে না। আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে, আমরা এ বন রক্ষা বা সংরক্ষণ করি, কারণ তাতে আমাদের আয় বাড়ে, তৃপ্তি বাড়ে, দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়, বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়; বিদেশীদের স্বার্থে নয়।

১৯ জানুয়ারি গিয়েছিলাম সুন্দরবনে। হরিণটানায় আমাদের জাহাজ রাতের নোঙর ফেলল। রাত কাটাব এখানে। হঠাৎ আমাদের গাইড বলল, 'স্যার, বাতি ফেলুন ঐখানে! শিংওয়ালা হরিণ।' অন্ধকারে ও জানল কী করে? তবু আলো ফেললাম। ঠিক তাই, জ্বল জ্বল করছে চোখগুলো। সুন্দর একটি হরিণ। বন অফিসের পাশে গাছের নিচে বসে আছে। ভাবলাম, এ রকম সুযোগ আর পাব না। সারা রাত হরিণ দেখব। হয়তোবা বাঘও! কি জানি যদি আমাদের চোখের সামনেই হরিণটিকে আক্রমণ করে, তবে তো আমার সফর সার্থক! আমাদের ক্ষুদ্র জাহাজের ছাদে বসে আমরা রাতে খাবার খাচ্ছি। এমন সময় আরো ইঞ্জিনের শব্দ এল। বুঝতে পারলাম, আমরা একা নই। আরো জাহাজ এখানে রাত কাটাবে। আমাদের জাহাজটি ছোট বিধায় আমরা কিছুটা ভেতরের দিকে নোঙর করেছি। কিন্তু এ কি! ওই জাহাজটিও আমাদের পাশে চলে এল। নামটা পড়ে নিলাম— সুন্দরবন ৯। সুন্দরবন ভ্রমণে বেরিয়েছে। বিশাল জাহাজ। সুন্দরবন ৯ মানে সুন্দরবন ১, ২... আরো আছে। আমাদের জাহাজ নোঙর করেছে নদীতে, কিন্তু একটি সুন্দরবন ৯ তো একেবারে কূলে ভিড়িয়ে দিল। জাহাজের আলোয় দেখতে পেলাম লোকজন জাহাজ থেকে লাফিয়ে কূলে উঠে গেল। জাহাজটিকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল! আমাদের অবাক হওয়ার পালা। বনের সৌন্দর্য দেখতে এসেছে, নাকি বন ধ্বংস করতে! বন বিভাগের কাউকে দায়িত্ব নিয়ে এগোতে দেখলাম না। ততক্ষণে আমাদের হরিণ হাওয়া। বেচারা! ঘুমাতে এসেছিল বাঘের ভয়ে কিন্তু...! কিছুক্ষণ পরই শুনলাম বিকট শব্দে গান। বাঘকে গান শোনাতেই কি সুন্দরবন ৯ এখানে এসেছে? সার্থক তার নাম। আমার বন্ধু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে একটি ইউটিউব ভিডিও তৈরি করে ফেলল। বিদেশী বন্ধুটির কাছে বেশ লজ্জা পেলাম! বাঘের অভয়ারণ্যে বাঘকে মারতে নয়, বাঘকে গান শোনাতে কেউ আসতে পারে তা আমার বোধগম্যে ছিল না! আমরা পালালাম।

পরদিন কচিখালীতে নোঙর পাতলাম। সকালের নাশতার পর বনের ভেতরে নৌকায় যাব। হঠাৎ করেই শুনি ভট ভট ভট শব্দ। বলা বাহুল্য, আমাদের পাশের জাহাজ থেকে ইঞ্জিন নৌকায় লোকজন চলছে 'নিঃশব্দে' বনের গান শুনতে! কিছুই বুঝতে পারলাম না! আমরা অপেক্ষায় থাকলাম কতক্ষণে এই ভট ভট ভট তাদের নৌকা ভ্রমণ শেষ করে ফেরত আসে! তাদের আসার পর আমরা গেলাম। বলা বাহুল্য, আমাদের নৌকায় ইঞ্জিন নেই। এখানে বসে আপনি পাতার শব্দও শুনতে পাবেন। ওরা কী করতে বনের ভেতর গেল বুঝলাম না। ভেতরে, বেশ ভেতরে গেলাম, পাখি ছাড়া কিছুই পেলাম না। বুঝতে পারলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী নৌকা পিকনিক পার্টি করতে গিয়ে সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

পরদিন গেলাম কটকায়। এ কটকার ওয়াচ টাওয়ারে যেতে গিয়েই আমরা এর আগে বাঘ দেখেছিলাম। আমরা তাই আগ্রহ নিয়েই গিয়েছি সেখানে। কিন্তু হায়! আমাদের আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে চারটি জাহাজ। পর্যটন শিল্প সচল, জাতীয় অর্থনীতিতে সুন্দরবনের প্রভাব স্পষ্ট। আমাদের গাইড বলল, স্যার সকালেই বের হতে হবে। কারণ? কারণ ভট ভট ভট ঢুকে গেলে কোনো পশুপাখি দেখতে পাবেন না! আমার ধারণা ছিল, লোকজন এখানে প্রকৃতি দেখতে আসে! 'না স্যার, এখানে পিকনিক করতে আসে!' সকালে আমরা সবার আগেই গেলাম নৌকা করে। বেশ আকর্ষণীয় ছিল ভ্রমণটি। শেষে গেলাম ওয়াচ টাওয়ারে। উপরে উঠে অবাক। কোথাও কোনো হরিণ নেই! কটকা বন অফিসকে পরে জানাতে গেলে বলল, সকালে চারটি জাহাজের লোকজন ওই রাস্তা দিয়ে বিচে গেছে। তাই হরিণ পালিয়েছে।

মনে পড়ে গেল পরিবেশ অর্থনীতির একটি ধারণা— ধারণক্ষমতা। বলা হয়েছে, প্রকৃতিনির্ভর কোনো পর্যটন শিল্পে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করলে তাতে প্রকৃতি বিপন্ন হয়। অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা কি ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পর্যটক পাঠাচ্ছি? আমার মনে হলো, প্রকৃতির ধারণক্ষমতা প্রকৃতির ক্ষমতার ওপরই কেবল নির্ভরশীল নয়। আমাদের আচরণের ওপরও তা নির্ভর করে। অর্থনীতির মূলকথা, মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করা আমাদের কাজ। আমাদের পর্যটকের সংখ্যা পৃথিবীর বহু দেশের পর্যটক সংখ্যার চেয়ে কম। এত অল্পসংখ্যক পর্যটকই যদি বনকে বিরান করে ফেলে, তবে আমরা যখন মধ্যম আয়ের দেশ হব, তখন কী হবে? ধারণক্ষমতা নির্ভর করে পর্যটকদের আচরণের ওপর। অনেকটা ট্রাফিক ব্যবস্থার মতো। সবাই ট্রাফিক নিয়ম মেনে চললে দেখবেন অনেক বেশিসংখ্যক গাড়িও শহরে ভালোভাবে চলতে পারে। আর তা না হলে ৬ কিংবা ১০ লেনের রাস্তায়ও ট্রাফিক জ্যাম হয়। অর্থাৎ মানুষের আচরণ ধারণক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। পর্যটকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে শেষ পর্যন্ত আমাদের সুন্দরবনই বিপন্ন হতে পারে। বিষয়টি বন বিভাগের কাছে স্পষ্ট থাকা উচিত। অন্যথায় দেখবেন সুন্দরবনের বদলে সেখানে নগর গড়ে তোলার দাবি উঠবে। তখন বন বিভাগের জন্য তা হবে মারাত্মক হুমকির। আশা করি, বন বিভাগ ব্যবস্থা নেবে।

আমাদের পর্যটন শিল্পকে প্রকৃতি-সহনীয় করতে হলে প্রয়োজন বিনোদন শিক্ষা। কী করে প্রকৃতিকে উপভোগ করা যায়, সে ধরনের শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা বন বিভাগেরই করা উচিত। একবার গিয়েছিলাম চীনের এক অভয়ারণ্যে। টিকিট কেনার সঙ্গেই দিয়ে দিল এক টুকরো কাগজ— কী করা যাবে কী করা যাবে না। কিছুক্ষণ পর নিয়ে গেল এক ঘরে, ভিডিও দেখাল। প্রকৃতিকে উপভোগ করতে হলে প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিত। প্রমথ চৌধুরী বহু আগেই বলেছিলেন, 'সুশিক্ষিত মাত্রেই স্বশিক্ষিত।' এ ব্যবস্থা স্বশিক্ষার একটি উপাদান।

সবশেষে কটকায় ঘুরে বেড়ানোর হাঁটা পথটিতে দেখলাম একটি বিরাট সাইনবোর্ড। পথ বন্ধ। কেবল পাটাতনের অভাবে তা অচল। বন বিভাগের মন থেকে ভিক্ষাবৃত্তি দূর করা উচিত। এ পথটি একসময় বিদেশী সাহায্যে তৈরি হয়েছিল। তৈরি করেছিল ইউএসএআইডি। সময়ের কারণে নষ্ট হয়েছে। তা ঠিক করতে কি আবারো ভিক্ষা করতে হবে? একটি মধ্যম আয়ের দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের মাথা থেকে শিগগিরই ভিক্ষাবৃত্তি দূর করতে হবে। পর্যটকদের জন্য যেকোনো ব্যবস্থার অর্থ তাদের টিকিট থেকেই জোগান দেয়া উচিত। ভিক্ষা করে বিনোদন শিল্প টেকানো যাবে না। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে এ বনকে টেকানো একদিন অসম্ভব হবে।

লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি
পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট